ভূমিকা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ই আগস্ট। কিন্তু যে স্বাধীনতা হয়তো অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের, সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত ছিল; সেই স্বাধীনতা আমরা পেলাম না। স্বাধীনতার সঙ্গে এলো দেশভাগ এবং তজ্জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। যখন পরাধীন ভারতবর্ষে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে 'আইন অমান্য' আন্দোলন চলছিল তখন অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলায় ১৯৩৩ খ্রি. ২৫ মার্চ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র শনিবার বারবেলা) পিতা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা কিরণকুমারী দেবীর গর্ভ থেকে চতুর্থ সন্তান হিসাবে জন্ম হয় শ্যামলেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের। দশম শ্রেণির ছাত্র যখন তখন শ্যামলকেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে সপরিবারে জন্মভিটা ত্যাগ করতে হয়। লেখার জন্য অসম্ভব পরিশ্রমী, সৃজনশীল মনন এবং সর্বদা নতুন কিছু করার বা বানাবার আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতে চাওয়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে দেশভাগ (বিশেষত বঙ্গভাগ) গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। খুলনার বালক-কৈশোর পর্বের স্মৃতিকে সঙ্গী করে এবং নিজের সময়, সমাজ ও জীবনকে মূলধন করে পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর সময় যত গড়িয়েছে লেখকের বৈচিত্র্যময় জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবে এক একটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

জন্মসূত্রে পাওয়া সময়পর্বকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিঙড়ে নিয়ে অনুভব করেছেন। খুলনাতে থাকাকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য আমেরিকান সৈন্যদের আনাগোনা, মুসলিম লিগের শক্তিবৃদ্ধি, মুসলিম বন্ধুদের ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত কৃষকদের মৃতদেহ, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, বাংলাদেশ নামে নতুন দেশের জন্ম হওয়া, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শ্যামল বড় হতে থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতায় এসে লেখকের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে যখন তিনি রসায়নবিদ্যা পড়ার জন্য কলেজে ভর্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গে তখন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায়ের শাসনকাল অন্যদিকে কমিউনিস্ট দল বিধানচন্দ্রের বিরোধীতা ও নিজেদের মতাদর্শ ছড়ানোর কাজে ব্যস্ত। রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শ্যামলের ব্যক্তিজীবনে খুব একটা শুভ হয়নি। কারণ এরফলেই লেখককে কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরবর্তী সময়েও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে শ্যামল সেভাবে কোনও দিন যুক্ত হয়নি। অবশ্য তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলী কোনও নির্দিষ্ট

রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর লেখকের বিশ্বাস রাখতেও সাহায্য করেনি। তাই আমরা বলতেই পারি লেখকের নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। তাই লেখকের রচনাতেও কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনও প্রভাব আমরা দেখতে পাই না।

বরং নানা রঙের মানুষের জীবনের কথা, নিজের জীবনের কথা, জীবনের দাবি, জীবনের রহস্য, প্রকৃতির রহস্য লেখককে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। জীবন ও প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে ছুটে গিয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। সেই জেলার চম্পাহাটিতে স্ত্রী-সন্তানসহ সপরিবারে বসবাস করেছেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কৃষিকাজ করেছেন। এছাড়াও ইস্পাত কারখানায় কাজ করা, প্রুফ রিডার, সাংবাদিকতা, সম্পাদনা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভোজনরসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে পরিচয়, বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা, নিজের জীবনকে নিয়ে নানারকম দুঃসাহসিক পরীক্ষা, ঘাম ফেলে জ্ঞান আহরণ লেখককে কখনও উপন্যাস নির্মাণের কাঁচামালের অভাব বুঝতে দেয়নি।

আমরা জানি, উপন্যাস বাস্তব জীবনের নানারূপকে তুলে ধরে। সময়ের কথা, সমাজের কথা, ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে। তবে উপন্যাসে সবকিছুই ফুটে ওঠে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সিক্ত হয়ে। আর লেখকের প্রকাশভঙ্গি লেখকের শৈল্পিক প্রতিভাকে উন্মোচিত করে। শিল্পরীতির মাধ্যমেই কোনও শিল্প সংরূপ বিশিষ্ট, অভিনব হয়ে ওঠে। তাই কোনও সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারের মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে বিষয় নির্বাচন বা বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য, শিল্পরীতি ইত্যাদির আলোচনা। এই আলোচনা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের কৃতিত্ব, প্রতিভা পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার অবকাশ থাকে সমালোচক, গবেষকের কাছে। তাই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে উপরিউক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন ও লেখক হিসাবে কৃতিত্ব, অভিনবত্ব গবেষণাধর্মী আলোচনায়, বিবৃতিমূলক ও বিশ্লেষণাত্বকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব।